সমকাল

18 APR 2026

এখনও পুরোদমে চালু হয়নি পাট রপ্তানি

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের অনেকে বলছেন, টিটির মাধ্যমে পাট রপ্তানি চালু হলেও এলসির মাধ্যমে এখনও বন্ধ রয়েছে। এর ফলে বাজারে উপযুক্ত দাম না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা

■ **শরীফ উদ্দিন সবুজ,** নারায়ণগঞ্জ থেকে

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কাঁচা পাট রপ্তানিতে বেশ কিছু কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়। এর ফলে কার্যত বন্ধ ছিল দেশের পাট রপ্তানি। ফলে পাটের দাম প্রতিবেশী দেশের তুলনায় মণপ্রতি প্রায় চার হাজার টাকা কম ছিল। কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টিটির মাধ্যমে পাট রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা উঠলেও এলসির মাধ্যমে রপ্তানি এখনও বন্ধ রয়েছে। ফলে পুরোদমে পাট রপ্তানি শুরু হতে পারছেন না। প্রায় সাড়ে ৩৪ হাজার টন পাটের জন্য বিদেশি ক্রেতারা ক্রয় আদেশ দিয়েও পাট নিতে পারছেন না। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। কৃষকও উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না পাটের। শিগগিরই রপ্তানি পুরোপুরি শুরু না করলে কৃষকরা পাট চাষে আগ্রহ হারাতে পারেন।

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কৃষক সোহরাব মিয়া। নিজের ও আত্মীয়স্বজনের উৎপাদিত পাট তিনি বিক্রি করেন নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ীদের কাছে। তিনি জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পাট রপ্তানি বন্ধ ছিল। ফলে পাটের যে মূল্য হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে রপ্তানি শুরু হওয়ায় পাটের দাম কিছুটা বেড়েছে। বর্তমানে পাট বোনার মৌসুম শুরু হয়েছে। অনেক স্থানে পঞ্চাশ ভাগ পাট বোনা হয়ে গেছে। এখন যদি পাট রপ্তানি ভালোভাবে শুরু হতো তাহলে পাটের দাম বাড়ত। কৃষক উৎসাহিত হতো। তাদের খরচে পুষত। কারণ, এবার তেল ও সারের দাম বেশি। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

ঝিনাইদহের এই কৃষকের কাছ থেকে পাট কিনে বিদেশে রপ্তানি করেন নারায়ণগঞ্জের সাদাত জুট এক্সচেঞ্জের মালিক দেলওয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সারাদেশে ৭০ লাখ বেল বা দুই কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার মণ পাট উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পাট রপ্তানি বন্ধ থাকায় এর মূল্য ছিল মণপ্রতি পাঁচ হাজার টাকার নিচে। বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর রপ্তানি শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়। সরকারের ঘোষণার পরে যার যার কাছে পাট রপ্তানির জন্য টিটি ও এলসি ছিল বিদেশি ক্রেতারা সেগুলোর সময় বাড়িয়ে দেয়। রপ্তানির ঘোষণার খবরে পাটের মূল্য বেড়ে যায়। তোষা পাট পাঁচ হাজার ৮০০ টাকার আশপাশে, মেস্তা পাঁচ হাজার ৫০০ থেকে পাঁচ হাজার ৬০০ টাকা, সুতি পাট পাঁচ হাজার থেকে পাঁচ হাজার ১০০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এলসির মাধ্যমে পাট রপ্তানি বন্ধ। ফলে পাটের দাম আবার কমতে থাকে। বর্তমানে তোষা পাট মণে প্রায় ৭০০ টাকা কমে পাঁচ হাজার ১০০ টাকায়, মেস্তা ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা কমে চার হাজার ৬০০ থেকে চার হাজার ৭০০ টাকা, সুতি পাট ৭০০ থেকে ৯০০ টাকা কমে চার হাজার ২০০ থেকে চার হাজার ৪০০ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। অথচ বর্তমান সময়ে ভারতের কৃষকরা পাট বিক্রি করছে কমবেশি ৯ হাজার টাকা মণ।

বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট ভারত, ব্রাজিল, নেপাল, মিসর, পাকিস্তান, তুরস্ক, চীন, ভিয়েতনাম, আরব আমিরাতে রপ্তানি হয়। সব দেশেই বর্তমানে বাংলাদেশের পাটের চাহিদা রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশ পাট রপ্তানি সেভাবে না করায় এসব দেশে এখন ভারতের পাট যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে ভারতের হাত ঘুরে পাট এসব দেশে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএ) চেয়ারম্যান খন্দকার আলমগীর কবির এ প্রসঙ্গে বলেন, টিটির ছয় হাজার ৩৭৭ টন এক্সপোর্টের অনুমোদন দেওয়ার কথা। এলসির পণ্য রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়নি। রপ্তানি না হলে ১৫ থেকে ২০ লাখ বেল পাট রয়ে যাবে। ফলে ব্যবসায়ীদের টাকা আটকে থাকবে। তারা আগামী মৌসুমে পাট কম কিনবে। ফলে এ বছর সার, তেলের বেশি দাম দিয়ে উৎপাদন করা পাটের দাম আগামী মৌসুমে কৃষকরা পাবে না। সবার স্বার্থে এখন পাট রপ্তানি পুরোপুরি খুলে দেওয়া দরকার।

জানতে চাইলে বেসরকারি পাটকল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএমএ) সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল বারিক খান সমকালকে বলেন, পাট নিয়ে নানান কারসাজি থাকে। কৃত্রিম সংকটের প্রবণতা আছে দীর্ঘদিন ধরে। কাঁচা পাট বেশি রপ্তানি হলে দেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পাটের সংকট তৈরি হয়। বর্তমানে রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়, বরং শর্তসাপেক্ষে রপ্তানি করা হয়। তবে অবৈধ পথে কাঁচা পাট রপ্তানি আগের মতোই চলছে। কাঁচা পাট রপ্তানির বিষয়ে দেশের শিল্পের স্বার্থ আগে দেখা উচিত।

সমকাল
18 APR 2026

দেশের ব্যবসার পরিবেশ কর্মসংস্থানমুখী নয়

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে

প্রতিবছর শ্রমবাজারে নতুন মুখ — ২০ লাখ

প্রতিবছর গড় কর্মসংস্থান — ৯ লাখ

পরামর্শ

এমন একটি ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা স্বচ্ছন্দে ব্যবসা করতে পারবেন এবং নতুন কর্মসংস্থান হবে

- ২০২৪ সাল পর্যন্ত এক দশকে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় ৬ শতাংশ
- পর্যাপ্ত ও মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেনি জিডিপি প্রবৃদ্ধি
- ব্যবসার পরিবেশ প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপযোগী ছিল না
- কর্মসংস্থানে বড় ঘাটতি সামাজিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে
- ব্যবসায়িক পরিবেশের অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যয়

নিয়মকানুন পরিপালন করতে গিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা

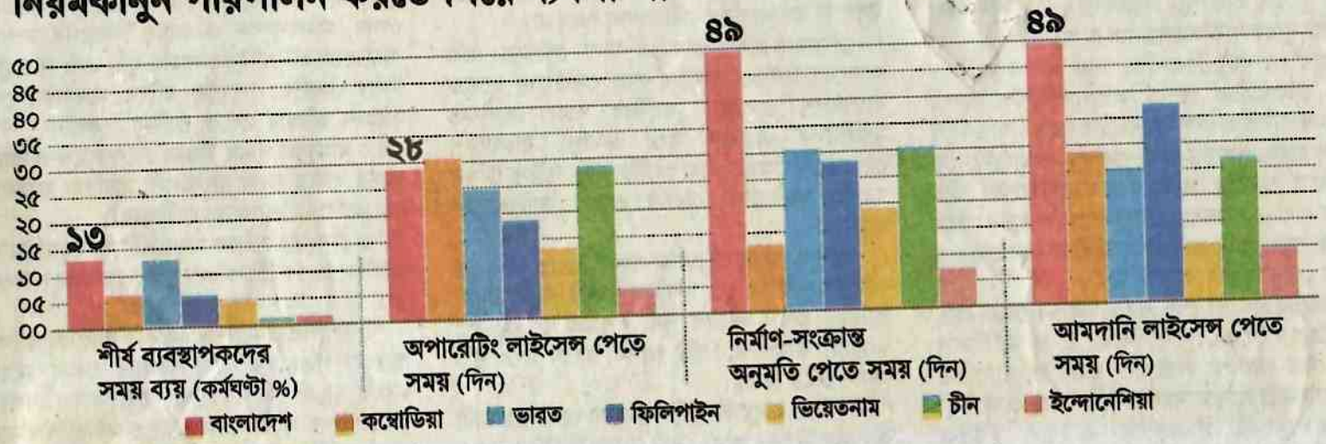

আনোয়ার ইব্রাহীম

দেশের অর্থনীতি এক গভীর বৈপরীত্যের মধ্য

পরিবেশ উন্নয়ন এবং ডি-রেগুলেশন বাস্তবায়নের কথা বলে আসছেন।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬

বেসরকারি খাতে একটি প্রকট 'দ্বৈত কাঠামো' গড়ে উঠেছে। এর একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চ উৎপাদনশীল বড় প্রতিষ্ঠান বা 'ফ্রন্টিয়ার ফার্মস', যারা মোট আনুষ্ঠানিক খাতের রাজস্বের ৭৫ শতাংশ

নির্মাণ অনুমতির জন্য লাগে প্রায় ৪৯ দিন, যা চীন বা ভারতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এ ছাড়া একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক খরচ আনুমানিক ১০ হাজার মার্কিন ডলার, যা তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য প্রবেশাধিকার সীমিত করে দিচ্ছে। যারা এই উচ্চ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করছেন, তাদের বিনিয়োগের আগ্রহ ১৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

কেন প্রতিষ্ঠানগুলো অনানুষ্ঠানিক থাকতে চায়

বাংলাদেশে অধিকাংশ ব্যবসা কেন নিবন্ধিত হয়ে মূলধারায় আসতে চায় না, তার ওপর এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রায় ৭৩ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান মনে করে নিবন্ধন ফি ও জটিল প্রক্রিয়াই তাদের প্রধান বাধা। এ ছাড়া ৭১ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের মতে, নিবন্ধিত হলে তাদের ওপর বড় করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। ৬১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শন বা হয়রানি এড়াতে অনানুষ্ঠানিক থাকাকেই বেশি নিরাপদ ভাবছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো অনানুষ্ঠানিক থাকার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতাও কম থাকে এবং তারা ব্যাংক ঋণ বা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা কখনোই বড় হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। ৫৯ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান মনে করে ব্যাংক ঋণ পাওয়া সহজ হলে তারা নিবন্ধিত হতে রাজি হতো।

অবকাঠামো ও অর্থায়নের ঘাটতি

বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে ব্যবসার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি মাসে ২৬ বার বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক বিক্রির প্রায় ৯ শতাংশ ক্ষতি হয়। এই কারণে প্রায় এক-চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠান জেনারেটরের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অর্থায়নের ক্ষেত্রেও ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান।

নিয়মকানুন পরিপালন করতে গিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা

আনোয়ার ইব্রাহীম

দেশের অর্থনীতি এক গভীর বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী এক দশকে গড়ে ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে সেই প্রবৃদ্ধি পর্যাপ্ত এবং মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ দেশের ব্যবসা পরিবেশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপযোগী ছিল না।

চলতি এপ্রিলে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' প্রতিবেদনে এমন মন্তব্য করে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক রপ্তানি সুবিধা (জিএসপি) ধীরে ধীরে কমবে। এ অবস্থায় ব্যবসা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বব্যাংকের এবারের প্রতিবেদনটি 'ব্যবসা পরিবেশ'-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এর ওপর আলাদা বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, এ সমস্যার সমাধান করতে হবে সরকারকেই। কেবল প্রবৃদ্ধির পেছনে না ছুটে এমন একটি ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা স্বচ্ছন্দে ব্যবসা করতে পারে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এ জন্য নিয়ন্ত্রণ কমানোর পথে হাঁটতে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে এ সংস্থা বলছে, এ নীতির সফল বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশ তার বিপুল শ্রমশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করতে সক্ষম হবে।

বিশ্বব্যাংক এ সময় এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে যখন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। এ সরকারের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী নির্বাচনের আগে থেকেই ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং ডি-রেগুলেশন বাস্তবায়নের কথা বলে আসছেন।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশে প্রতিবছর গড়ে মাত্র ৯ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু শ্রমবাজারে প্রতিবছর যুক্ত হচ্ছে প্রায় ২০ লাখ নতুন মুখ। এই বিশাল ঘাটতি শুধু আয় বা উৎপাদনশীলতাকেই কমিয়ে দিচ্ছে না, বরং দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতাকেও হুমকির মুখে ফেলছে।

উৎপাদনশীলতার বৈপরীত্য ও বেসরকারি খাতের স্থবিরতা

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে 'উৎপাদনশীলতার বৈপরীত্য' চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও কোম্পানি পর্যায়ে উদ্ভাবন বা ব্যাপকভিত্তিক গতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। উৎপাদন এবং সেবা খাতে শ্রমিকপ্রতি আয় দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের বিবেচনায় অনেক কম। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, সেবা খাতে উৎপাদনশীলতা ২০১৬ সাল থেকে কার্যত স্থবির হয়ে আছে।

নতুন কোম্পানি গঠনের হারও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। বর্তমানে আনুষ্ঠানিক খাতের মাত্র ৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান গত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা চীন (৩২ শতাংশ) বা ভিয়েতনামের (৪০ শতাংশ) তুলনায় অনেক কম। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) জিডিপির ১ শতাংশের নিচে, যা বৈশ্বিক মানদণ্ডে সর্বনিম্ন পর্যায়ের। এই বিনিয়োগ আবার উৎপাদনমুখী খাতের চেয়ে ইউটিলিটি খাতে বেশি হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান হস্তান্তরের সুযোগ কমছে।

বেসরকারি খাতে দ্বৈত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের সংকট

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে একটি প্রকট 'দ্বৈত কাঠামো' গড়ে উঠেছে। এর একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চ উৎপাদনশীল বড় প্রতিষ্ঠান বা 'ফ্রন্টিয়ার ফার্মস', যারা মোট আনুষ্ঠানিক খাতের রাজস্বের ৭৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই বিশাল আয়ের মালিক হলেও তারা দেশের মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ১৫ শতাংশ সৃষ্টি করে।

বিপরীতে দেশের সিংহভাগ কর্মসংস্থান তৈরি করে ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যবসাগুলো, যারা প্রতিনিয়ত নীতিগত বৈষম্য এবং প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিবেশের শিকার। তৈরি পোশাক খাতে এই বৈষম্য আরও স্পষ্ট। এখানকার অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলো মোট রাজস্বের অর্ধেক আয় করলেও বেসরকারি খাতের প্রতি ১২টি চাকরির মধ্যে মাত্র একটি চাকরি তৈরি করছে। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বড় হওয়ার সুযোগ না দিলে দেশে কর্মসংস্থান সংকট কাটানো সম্ভব নয় বলে রিপোর্টে সতর্ক করা হয়েছে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পাহাড়

ব্যবসায়িক পরিবেশের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে উচ্চ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যয় বা 'রেগুলেটরি বার্ডেন'-কে চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের তাদের কর্মঘণ্টার গড়ে ১৩ শতাংশ ব্যয় করতে হয় কেবল সরকারি নিয়মকানুন পরিপালনের পেছনে, যাকে রিপোর্টটিতে 'টাইম ট্যাক্স' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই বোঝা দেশের সব জায়গায় সমান নয়। যেমন– চট্টগ্রামে কর্মকর্তাদের ৪০ শতাংশ এবং বরিশালে প্রায় ৬০ শতাংশ সময় এই আমলাতান্ত্রিক কাজে অপচয় হয়।

বিশ্বব্যাংক বলছে, একটি অপারেটিং লাইসেন্স পেতে বাংলাদেশে গড়ে ২৮ দিন সময় লাগে এবং প্রতিষ্ঠানের মতে, নিবন্ধিত হলে তাদের ওপর বড় করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। ৬১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শন বা হয়রানি এড়াতে অনানুষ্ঠানিক থাকাকেই বেশি নিরাপদ ভাবছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো অনানুষ্ঠানিক থাকার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতাও কম থাকে এবং তারা ব্যাংক ঋণ বা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা কখনোই বড় হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। ৫৯ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান মনে করে ব্যাংক ঋণ পাওয়া সহজ হলে তারা নিবন্ধিত হতে রাজি হতো।

অবকাঠামো ও অর্থায়নের ঘাটতি

বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে ব্যবসার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি মাসে ২৬ বার বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক বিক্রির প্রায় ৯ শতাংশ ক্ষতি হয়। এই কারণে প্রায় এক-চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠান জেনারেটরের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অর্থায়নের ক্ষেত্রেও ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। রপ্তানিমুখী বড় প্রতিষ্ঠানগুলো মাত্র ২ শতাংশ সুদে ঋণ পেলেও সাধারণ উদ্যোক্তাদের ১৩ শতাংশ পর্যন্ত সুদ গুনতে হচ্ছে। বর্তমানে ৪২ শতাংশ বড় প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং সুবিধা পেলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ২৯ শতাংশ। ঋণের অভাব উৎপাদনশীলতাকে সাড়ে ৪ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিচ্ছে।

উত্তরণের পথরেখা স্মার্ট ডি-রেগুলেশন

সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বিশ্বব্যাংক একটি তিন স্তরের 'স্মার্ট ডি-রেগুলেশন' মডেল প্রস্তাব করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা কমানো এবং ডি-রেগুলেশনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

স্বল্পমেয়াদি সংস্কার পথরেখায় কম ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করা এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল 'এন্ড-টু-এন্ড' সেবা নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এ ছাড়া অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূলধারায় আনতে কর ছাড়ের মতো প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলেছে। মধ্যমেয়াদি সংস্কার পথরেখায় লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজ এবং বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার রূপরেখায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা কমিয়ে 'জাতীয় শুল্ক নীতি' বাস্তবায়ন করার পরামর্শ বিশ্বব্যাংকের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বড় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য সাপ্লায়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা, যাতে তারা বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

প্রথম আলো

18 APR 2026

ডেনিম পোশাকের রপ্তানি বাড়ছে

বড় দুই বাজার

বাংলাদেশ থেকে জিনস রপ্তানি শুরু হয় চার দশক আগে। বর্তমানে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

৪২ বছর আগের কথা। চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট এলাকার প্যাসিফিক জিনস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত নাসির উদ্দিন তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে গড়ে তোলেন জিনস তৈরির কারখানা এনজেডএন ফ্যাশন। সেই কারখানা থেকে ১৯৮৪ সালে দেশের প্রথম জিনস রপ্তানি হয়। ইতালির ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কারেরা'র জন্য ১২ হাজার ডলারের জিনস পোশাক রপ্তানি করেছিল এনজেডএন ফ্যাশন।

জিনস রপ্তানি শুরুর চার দশক পর এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থান বাংলাদেশের দখলে। কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশ এই সাফল্যের মুকুট অর্জন করেছে। প্রতিবছরই ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল (অটেক্সা) ও ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে গত বছর ২৬০ কোটি মার্কিন ডলারের ডেনিম পোশাক ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি হয়েছে। ২০২৪ সালে রপ্তানি হয়েছিল ২০৭ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক। অর্থাৎ বড় দুই বাজারে বাংলাদেশের ডেনিম পোশাকের রপ্তানি গত বছর প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে।

সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা বলছেন, দেশে ডেনিম কাপড় উৎপাদনে গত দেড় দশকে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে। পাশাপাশি দেশে ডেনিম পোশাকের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল গ্যাস ও পানি পাওয়া যায় সাশ্রয়ী মূল্যে। আবার ভূরাজনৈতিক কারণে চীন থেকে ডেনিম পোশাকের ক্রয়াদেশ সরছে, যার একটি অংশ বাংলাদেশে আসছে। তা ছাঁড়া এক দশক ধরে ঢাকায় আন্তর্জাতিক ডেনিম এক্সপো আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ বাড়ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি রপ্তানি আয়ের জোগান দেয় তৈরি পোশাক খাত। এই খাতে দীর্ঘদিন ধরে টি-শার্ট, ট্রাউজার, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাসের মতো কম দামের পোশাকই বেশি রপ্তানি হয়। দেরিতে হলেও ডেনিমের মতো ভ্যালু অ্যাডেড বা বেশি মূল্যের পোশাক শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নিচ্ছে।

এ নিয়ে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গত বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমরা অনেক দিন ধরেই ভ্যালু অ্যাডেড বা বেশি দামের পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। ডেনিম পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি সেই চেষ্টারই অংশ।' তিনি আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে ডেনিমের চাহিদা সারা বছরই থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর বাজারে ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে

যুক্তরাষ্ট্র

দেশ	২০২৪	২০২৫	প্রবৃদ্ধি (%)
বাংলাদেশ	৭১	৯৬	৩৪.০৬
মেক্সিকো	৬৫	৬৪	-২.১৮
ভিয়েতনাম	৩৯	৫০	২৬.৩৩
পাকিস্তান	৪৩	৫০	১৬.৬২
কম্বোডিয়া	২০	২৫	২২.০২

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

দেশ	২০২৪	২০২৫	প্রবৃদ্ধি (%)
বাংলাদেশ	১৩৬	১৬৪	২১.০৩
পাকিস্তান	৮৪	১০৩	২৩.২০
তুরস্ক	৯৮	৯৮	০.৪৮
তিউনিসিয়া	৩৮	৪০	২.৬৭
চীন	২৩	২৯	২৭.৪৮

হিসাব কোটি ডলারে

দেশে ডেনিম কাপড় উৎপাদনের নতুন নতুন কারখানার পাশাপাশি আধুনিক ওয়াশিং প্ল্যান্ট হচ্ছে। ফলে ডেনিম পোশাকের রপ্তানি প্রতিবছরই বাড়ছে।

দুই বাজারেই বাংলাদেশ সেরা

বাংলাদেশ গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৯৬ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে, যা এর আগের বছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেশি। এ ক্ষেত্রে প্রায় ২৬ শতাংশ হিস্যা নিয়ে ডেনিম পোশাক শীর্ষে রয়েছে।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, মেক্সিকো দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডেনিম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তারা গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ছাড়া ভিয়েতনাম ও পাকিস্তান ৫০ কোটি ডলার করে ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে। ভিয়েতনামের রপ্তানি ২৬ শতাংশ ও পাকিস্তানের রপ্তানি সাড়ে ১৬ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া কম্বোডিয়া গত বছর রপ্তানি করে ২৫ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক। তাদের প্রবৃদ্ধি হয় ২২ শতাংশ।

অন্যদিকে ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউভুক্ত দেশগুলোতে গত বছর বাংলাদেশ ১৬৪ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। ইইউতেও বাংলাদেশ শীর্ষ ডেনিম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। দ্বিতীয় পাকিস্তান। গত বছর পাকিস্তান ১০৩ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে, প্রবৃদ্ধি ২৩ শতাংশ।

এ ছাড়া ইইউর বাজারে গত বছর ৯৮ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে তুরস্ক। তাদের প্রবৃদ্ধি দশমিক ৪৮ শতাংশ। গত বছর তিউনিসিয়া ৪০ কোটি ও চীন ২৯ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিউনিসিয়ার ২ দশমিক ৬৭ শতাংশ ও চীনের সাড়ে ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

দেশের রপ্তানিকারকেরা জানান, আরামদায়ক, স্থায়িত্ব, সাশ্রয়ী মূল্য ও ক্যাজুয়াল ফ্যাশনের প্রতি মানুষের আগ্রহের কারণে ডেনিমের চাহিদা বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালে ডেনিম পোশাক আমদানি হয়েছিল প্রায় ৩৩৮ ডলারের, যা গত বছর বেড়ে হয়েছে ৩৬৮ কোটি ডলার। অন্যদিকে ২০২৪ সালে ইইউর দেশগুলো ৪৭২ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক আমদানি করে। গত বছর সেটি বেড়ে হয় ৫৫০ কোটি ডলার।

এক দশকে অবস্থান সুসংহত

এক দশক আগে দেশে ডেনিম কাপড় উৎপাদনের মিল ছিল ১০-১২টি, যা বর্তমানে পঞ্চাশের কাছাকাছি। একাধিক উদ্যোক্তা জানান, বর্তমানে চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ডেনিম কাপড় দেশীয় মিলগুলো সরবরাহ করে। আর বাকি ৪০ শতাংশ ডেনিম কাপড় তুরস্ক, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়।

ডেনিম পোশাকে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়াতে ২০১৪ সাল থেকে ঢাকায় বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপো নামে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করছে পোশাকশিল্পের সফল উদ্যোক্তা মোস্তাফিজ উদ্দিনের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ (বিএই)। এতে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ বিশ্বখ্যাত ডেনিম মিল এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও রাসায়নিক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নেয়। আসেন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধিরা।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে শিন শিন গ্রুপের পাঁচটি কারখানার মধ্যে চারটিতে ডেনিম পোশাক তৈরি হয়। গত অর্থবছরে গ্রুপটি ৫ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই ডেনিম পোশাক।

জানতে চাইলে শিন শিন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদাত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ডেনিম এক্সপো আমাদের মার্কেটিংয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। ক্রেতারা আমাদের সক্ষমতা সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছে, যা কিনা আমাদের ডেনিম পোশাকের বাজার ধরতে ব্যাপক সহায়তা করেছে।'

ডেনিম হলে অন্যান্য পণ্য কেন নয়

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের বাইরে মাত্র চারটি পণ্যের রপ্তানি এক বিলিয়ন তথা ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলকে পৌঁছালেও অন্যগুলো পারছে না। ফলে দেশের সার্বিক পণ্য রপ্তানি এখনো ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারেনি।

জানতে চাইলে বিএইর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ডেনিম এক্সপার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোস্তাফিজ উদ্দিন বলেন, 'ডেনিম পোশাকে পারলে অন্য সম্ভাবনাময় পণ্যেও আমরা পারব। আসলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকাটাই বড় সমস্যা। এটি দূর করতে ডেনিম পণ্যের প্রদর্শনী করা দরকার। আমার প্রতিষ্ঠান যদি এককভাবে ডেনিম এক্সপো করতে পারে, তাহলে রাষ্ট্র চাইলে এমন কয়েকটি প্রদর্শনী কেন করতে পারবে না।'